দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 12 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিয়ে কিছু কথা

ড. তারেক শামসুর রেহমান

সাম্প্রতিক সময়ে উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে। ইউজিসি থেকে চারজন সদস্যকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে। বেশ ক'টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সরিয়ে দেয়ার একটি সিদ্ধান্তও সরকার নিয়েছে। এর আগে একটি সার্চ কমিটিও গঠিত হয়েছিল, যাদের কাজ হবে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়া উপাচার্য নিয়োগ করা। সরকার সামগ্রিকভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একটা পরিবর্তন আনতে চাচ্ছেন- সরকারের এসব সিদ্ধান্ত দেখে তাই মনে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এসব সিদ্ধান্ত উচ্চশিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে কতটুকু সহায়ক হবে? মাননীয় রাষ্ট্রপতি বেশ কিছুদিন ধরেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে কথা বলে আসছেন। রাষ্ট্রপতি তো স্পষ্ট করেই বলছেন উচ্চশিক্ষার মান যদি বাড়ানো না যায়, তাহলে বিশ্বায়নের যুগে আমরা টিকে থাকতে পারবো না। প্রশ্ন হচ্ছে হঠাৎ করে এই প্রশ্নটি উঠলো কেন, কিংবা কেনইবা উচ্চশিক্ষার মানের অবনতি ঘটলো। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে উচ্চশিক্ষার মানের অবনতির একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ না দেওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের খবর প্রায় প্রতিদিনই পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়ে আসছিল। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই এর প্রতিকার হয়েছে।

উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নের কথা যখন আমরা বলি তখন সংগত কারণেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক প্রণীত উচ্চশিক্ষার কৌশলগত পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। ওই কৌশলপত্রটি প্রণয়ন করা হয়েছিল গেল বছর এবং তা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়াও হয়েছিল। ওই কৌশলপত্রে আগামি ২০ বছরে উচ্চশিক্ষায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে পাবলিক তথা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। কমিটি আরো ২৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছে। কৌশলপত্রে চারটি ধাপে এসব সুপারিশ বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়নের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। একই সাথে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নের কথাও বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দেশে অতীতে এ ধরনের কোন কৌশলপত্র তৈরী করা হয়নি। এটাই প্রথম। দেশে সাম্প্রতিক সময়ে উচ্চশিক্ষা নিয়ে যেসব প্রতিবেদন পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তাতে করে যে কেউ হতাশ হতে বাধ্য। বিশেষ করে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি ও জালিয়াতির যেসব খবর পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তাতে করে উচ্চ শিক্ষায় বড় ধরনের ধস নেমেছিল। এক এক বিশ্ববিদ্যালয় এক এক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছিল। এমনকি শিক্ষকদের পদোন্নতির ব্যাপারেও রয়েছে এক এক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক এক নিয়ম। এ কারণেই এ ধরনের একটি কৌশলপত্রের প্রয়োজন ছিল। আমরা একুশ শতকে প্রবেশ করেছি। মানসম্মত একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যদি আমরা প্রবর্তন করতে না পারি, তাহলে বিশ্বায়নের এই যুগে প্রতিযোগিতায় আমরা টিকে থাকতে পারবো না। ইউজিসি তাদের কৌশলপত্রে বেশ কিছু সুপারিশ পেশ করেছে। যেমন বলা হয়েছে, একটি অভিন্ন নীতিমালার ভিত্তিতে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হবে, প্রচলিত স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পুনর্নির্ধারণ করা, লেজুড়বৃত্তিক শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা, সার্চ কমিটির মাধ্যমে ভিসি নিয়োগ দান, মেধা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ডিন নিয়োগ, শিক্ষক নিয়োগে প্রচলিত ব্যবস্থা বাতিল করে ইউজিসির অধীনে একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করা, একটি অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন, সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি অভিন্ন সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা, গবেষণার জন্য রিসার্চ কাউন্সিল গঠন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বাড়ানো, ছাত্র বেতন বৃদ্ধি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে ব্যাপক সংস্কার এবং ইউজিসিকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি। যেকোন বিবেচনায় এসব সুপারিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সহায়ক। ইউজিসি অভিন্ন নীতিমালার ভিত্তিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালনার কথা বলছে। এটা যুক্তিযুক্ত। '১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন দ্বারা বেশ ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হলেও, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কিছু নীতিমালা রয়েছে, যা সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নয়। যেমন পদোন্নতি। এই পদোন্নতির নীতিমালা এক এক বিশ্ববিদ্যালয়ে এক এক নিয়মে চলে। রাজশাহী ও চট্টগ্রামে যে পদোন্নতির নীতিমালা অনুসরণ করা হয়, তা খুবই দুর্বল। এখানে অভিন্ন নীতিমালা থাকবে। প্রভাষক থেকে অধ্যাপক পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে প্রকাশনার সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। প্রভাষক হিসেবে যে প্রবন্ধ জমা দিয়েছেন, একই প্রবন্ধ পরবর্তীতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপকের ক্ষেত্রে পদোন্নতির নীতিমালায় মৌলিক গ্রন্থ থাকতে হবে এবং বিদেশের জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ থাকতে হবে। তবে যৌথ প্রবন্ধ ও একক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে হিসাবটা ভিন্ন হবে। যৌথ প্রবন্ধ হলেই পয়েন্ট ভাগ হয়ে যাবে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে 'পয়েন্ট ব্যবস্থা' চালু করা যেতে পারে (শিক্ষাগত যোগ্যতা, গবেষণা, শিক্ষকতার বয়স, উচ্চশিক্ষা, প্রবন্ধ-এভাবে পয়েন্ট ভাগ হতে পারে)। অধ্যাপক পদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে পিএইচডি ডিগ্রী ও মৌলিক গ্রন্থ বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং একই নীতিমালা সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুসরণ করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ প্যানেল তৈরী ও ইউজিসির তত্ত্বাবধানে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। মনে রাখতে হবে ১৯৭৩ আর ২০০৭ বা ২০১০ সাল এক নয়। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে এবং আগামিতে আরো বাড়বে। সুতরাং প্রচুর শিক্ষকের দরকার হবে। এজন্য পিএসসির আদলে ইউজিসির আলাদা একটি উইং থাকা দরকার, যাদের দায়িত্ব শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ার দেখভাল করা। ইউজিসির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে এটি পরিচালিত হবে। তিন ষ্টেজে এই পরীক্ষা সম্পন্ন হতে পারে। প্রথম, লিখিত পরীক্ষা, দ্বিতীয়, শ্রেণী কক্ষে পাঠদান, তৃতীয়, মৌখিক পরীক্ষা। আমি শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের উপর গুরুত্ব দিতে চাই। কেননা প্রথম শ্রেণী পেলেই যে সে ভালো শিক্ষক হবে, তার কোন গ্যারান্টি নেই। তিনি পাঠদানে সক্ষম কীনা, তা দেখা দরকার। সুতরাং ভালো শিক্ষকের জন্য ক্লাস পারফরমেন্স জরুরী। নিয়োগের আগে ইউজিসি এটি দেখতে পারে। আরো দু'টো বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে। নিয়োগের পর যিনি প্রভাষক হিসেবে যোগ দিলেন তাকে নূন্যতম এক বছর বিভাগের একজন সিনিয়র শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। বিদেশে এ ধরনের নিয়ম আছে। দ্বিতীয়ত, নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ট্রেনিংও জরুরী। কিভাবে ক্লাস নিতে হবে, কিভাবে ছাত্রদের সাথে 'কমিউনিকেশন হবে', কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে তা শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে নতুনদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আর এ কাজটি করতে পারে ইউজিসি। আমার ধারণা এ ব্যাপারে বৈদেশিক সহায়তা পাওয়া যাবে। আজ সময় এসেছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকদের এ ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া। অনেকের মাঝেই এক ধরনের ভীতি থাকে। প্রশিক্ষণ দিলে এই ভীতি কেটে যাবে। ভিসি কিংবা ডিন নিয়োগের ব্যাপারে ইউজিসি যে প্রস্তাব করেছে, তা যথেষ্ট বাস্তব সম্মত। এই ভিসি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এত বেশি রাজনীতি হয় যে অনেক যোগ্য লোকই শেষ পর্যন্ত ভিসি হতে পারেন না। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সম্পৃক্ততার কারণে অনেক 'যোগ্য' শিক্ষককে রেখে কমযোগ্যতা সম্পন্ন অধ্যাপকরা ভিসি হয়ে যাচ্ছেন। এজন্যই দরকার সার্চ টিম। আর একটা জিনিস বিবেচনায় নেয়া দরকার। একবার ভিসি নিয়োগ হয়ে গেলে ভিনি দ্বিতীয়বার ভিসি হবেন না এবং তাকে কোন অবস্থাতে সরানো যাবে না। দুর্নীতি কিংবা নৈতিক স্খলন জনিত কারণে তাকে যদি সরাতে হয়, তাহলে একটি বিশেষ ব্যবস্থার আওতায় তাকে অব্যাহতি দিতে হবে। বর্তমান ব্যবস্থায় ভিসি পদের সাথে যেহেতু 'রাজনীতি' জড়িত, সে কারণেই ভিসিদেরকে 'রাজনীতি' করতে হয়। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তাই এর প্রতিফলন ঘটে। যদি ডিন নির্বাচনের ব্যবস্থা অনুষদের সিনিয়ারিটির ভিত্তিতে হয়, তাহলেও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ঘটবে না। দলীয়ভাবে তখন শিক্ষক নিয়োগ হবে না। এই ব্যবস্থা যদি প্রবর্তন করা না যায়, তাহলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক সমর্থ বাড়ানোর দরকার। সরকারের উপর আর্থিক নির্ভরতা কমাতে হবে। ছাত্র বেতনও পর্যায়ক্রমে বাড়ানো যেতে পারে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 'ইভেনিং শিফট' চালু করতে পারে। এই শিফটএ যারা পড়তে আসবেন, তারা নির্দিষ্ট অংকের টাকা ভর্তি ফি জমা দিয়েই আসবেন। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক সামর্থ কিছুটা হলেও বাড়বে। ক্যাম্পাসগুলো দুপুরের পরই ফাঁকা হয়ে যায়। পরের সময়টুকু খুব সহজেই ব্যবহার করা যায়। এজন্য প্রয়োজনে দ্বিতীয় শিফট-এর জন্য শিক্ষকও নিয়োগ করা যেতে পারে।

আজ সময় এসেছে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকদের এ ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া। অনেকের মাঝেই এক ধরনের ভীতি থাকে। প্রশিক্ষণ দিলে এই ভীতি কেটে যাবে। ভিসি কিংবা ডিন নিয়োগের ব্যাপারে ইউজিসি যে প্রস্তাব করেছে, তা যথেষ্ট বাস্তব সম্মত। এই ভিসি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এত বেশি রাজনীতি হয় যে অনেক যোগ্য লোকই শেষ পর্যন্ত ভিসি হতে পারেন না। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সম্পৃক্ততার কারণে অনেক 'যোগ্য' শিক্ষককে রেখে কমযোগ্যতা সম্পন্ন অধ্যাপকরা ভিসি হয়ে যাচ্ছেন। এজন্যই দরকার সার্চ টিম।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালনার জন্য নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। মনে রাখতে হবে ১৯৭৩ সালে যখন বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল, তখনকার পরিস্থিতি আর আজকের পরিস্থিতি এক নয়। স্বায়ত্তশাসন দরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য, এটা ঠিক আছে। স্বায়ত্বশাসন ঠিক রেখেই এক ধরনের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করতে হবে। ইতোমধ্যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ইউজিসি একটি অভিন্ন আইন তৈরি করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষা উপদেষ্টার উপস্থিতিতে তা আলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের সাথে কথা বলতে হবে। এরই মাঝে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এই আইন প্রত্যাখান করেছেন। এজন্যই শিক্ষকদের সাথে কথা বলা জরুরি। আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একুশ শতকের উপযোগী হিসেবে গড়ে উঠুক। নতুন নতুন বিভাগ চালু হোক, গবেষণা হোক। এজন্য যা দরকার তা হচ্ছে সকল ধরনের প্রভাবের উর্ধে থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে শিক্ষক নিয়োগ করা। আমার বিশ্বাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক এমনটিই চান।

[লেখক : অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়]